BA CBCS POLITICAL SCIENCE HONS- 6TH SEM

DSE-4: HUMAN RIGHTS IN A COMPARATIVE PERSPECTIVE

TOPIC 3: STRUCTURAL VIOLENCE

(A. CASTE AND RACE: SOUTH AFRICA AND INDIA)

BY –PROF. SHYAMASHREE ROY

ভারতের বর্ণ ব্যবস্থা

ভারতে বর্ণ ব্যবস্থাটি বর্ণের উপমূর্তিগত জাতিগত উদাহরণ। প্রাচীন ভারতে এর উৎপত্তি, এবং মধ্যযুগীয়, আদি-আধুনিক, এবং আধুনিক ভারতে বিশেষত মুঘল সাম্রাজ্য এবং ব্রিটিশ রাজ্যে বিভিন্ন শাসকগোষ্ঠী দ্বারা রুপান্তরিত হয়েছিল। এটি আজ ভারতে ইতিবাচক কর্মসূচির ভিত্তি। বর্ণ ব্যবস্থা দুটি ভিন্ন ধারণা, বর্ণ এবং জাতিকে নিয়ে গঠিত, যা এই ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরের বিশ্লেষণ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

মুঘল যুগের পতন এবং ভারতে ব্রিটিশ ঔপেনিবেশিক সরকারের উত্থানের সময়ে ঘটে যাওয়া বর্ণব্যবস্থা আজকে যেমন রয়েছে বলে মনে করা হয়। মোগল যুগের পতন এমন শক্তিশালী পুরুষদের উত্থান দেখেছিল, যারা নিজেদেরকে রাজা, পুরোহিত এবং তপস্বীদের সাথে যুক্ত করেছিল, বর্ণের আদর্শ ও সামরিক রূপকে নিশ্চিত করেছিল এবং এটি বহু আপাত বর্ণহীন সামাজিক গোষ্ঠীকে আলাদা আলাদা বর্ণের সম্প্রদায়গুলিতে পুনর্নির্মাণ করেছিল। কঠোর বর্ণবাদী সংগঠনকে প্রশাসনের কেন্দ্রীয় মেকানিজম হিসাবে পরিণত করে ব্রিটিশ রাজ এই বিকাশকে অগ্রসর করেছিল। 1860 এবং 1920 এর মধ্যে, ব্রিটিশরা তাদের শাসনব্যবস্থায় বর্ণ ব্যবস্থার সূত্রপাত করেছিল, কেবলমাত্র খ্রিস্টান এবং নির্দিষ্ট বর্ণের লোকদেরকে প্রশাসনিক চাকরী এবং সিনিয়র নিয়োগ দেয়। 1920 এর দশকে সামাজিক অস্থিরতা এই নীতিতে পরিবর্তনের দিকে পরিচালিত করেছিল। এর পর থেকে thপনিবেশিক প্রশাসন নিম্নবিত্তদের জন্য নির্দিষ্ট শতাংশ সরকারি চাকরি সংরক্ষণ করে ইতিবাচক বৈষম্যের নীতি শুরু করে। 1948 সালে, বর্ণের ভিত্তিতে নেতিবাচক বৈষম্য আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এবং আরও ভারতীয় সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত ছিল; তবে, ভারতের বিভিন্ন অংশে এই সিস্টেমটি চালু রয়েছে ।

নেপালি বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ইসলাম, ইহুদী ও শিখ ধর্মের মতো ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চল ও ধর্মগুলিতেও বর্ণ ভিত্তিক পার্থক্য প্রচলিত রয়েছে। বর্তমান ভারতীয় বৌদ্ধধর্মকে বহু সংস্কারবাদী হিন্দু আন্দোলন, ইসলাম, শিখ ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম দ্বারা এটি চ্যালেঞ্জ করেছে।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর ভারত ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলির উন্নয়নের জন্য অনেকগুলি ইতিবাচক পদক্ষেপ নীতিমালা প্রণয়ন করে। এই নীতিগুলির মধ্যে উচ্চ গোষ্ঠী এবং সরকারী কর্মসংস্থানে এই গোষ্ঠীগুলির জন্য একটি কোটা স্থান সংরক্ষণ করা অন্তর্ভুক্ত।

বর্ণের আক্ষরিক অর্থ টাইপ, অর্ডার, রঙ বা শ্রেণি এবং শ্রেণিগুলিতে লোকদের গোষ্ঠীভুক্ত করার জন্য একটি কাঠামো ছিল যা বৈদিক ভারতীয় সমাজে প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল। প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থগুলিতে এটি প্রায়শই উল্লেখ করা হয়। চারটি

শ্রেণী হলেন ব্রাহ্মণ (পুরোহিতের লোক), ক্ষত্রিয় (যিনি রাজন্যাস নামে পরিচিত, যিনি ছিলেন শাসক, প্রশাসক ও যোদ্ধা), বৈশ্য (কারিগর, ব্যবসায়ী, ব্যবসায়ী এবং কৃষক) এবং শূদ্র (শ্রমজীবী শ্রেণি) ছিলেন। বর্ণের শ্রেণিবিন্যাসের স্পষ্টভাবে একটি পঞ্চম উপাদান ছিল, কারণ এই সমস্ত লোকেরা পুরোপুরি এর আওতার বাইরে যেমন, উপজাতির লোক এবং অস্পৃশ্যদের বলে মনে করা হত ।

বর্ণ শব্দটি মূলত একটি ভারতীয় শব্দ নয়, যদিও বর্তমানে এটি ইংরেজি এবং ভারতীয় উভয় ভাষায় ব্যবহৃত হয়। অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি অনুসারে, এটি পর্তুগিজ কাস্টা থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ "জাতি, বংশ, জাত" এবং মূলত "" খাঁটি বা অমীমাংসিত (মজুদ বা জাত) "। ভারতীয় ভাষাগুলিতে কোনও সঠিক অনুবাদ নেই, তবে বর্ণ এবং জাটি দুটি সবচেয়ে আনুমানিক পদ।

সামাজিক স্তরবিন্যাস, এবং এর সাথে যে বৈষম্য আসে তা ভারতে এখনও রয়েছে এবং এর সমালোচনা করা হয়েছে। সরকারী নীতিমালা এই অসমতা হ্রাস করার লক্ষ্যে সংরক্ষণ, পশ্চাৎপদ শ্রেণীর জন্য কোটা, কিন্তু বিদ্বেষপূর্ণভাবে সমাজবিজ্ঞানী অরবিন্দ শাহের মতে এই স্তরবিন্যাসকে বাঁচিয়ে রাখতে একটি উত্সাহও তৈরি করেছে। ভারত সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের ঐতিহাসিকভাবে বৈষম্যমূলক জনগোষ্ঠীগুলিকে তপসিলি বর্ণ হিসাবে মনোনীত অস্পৃশ্যদের এবং কিছু অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া বর্ণকে অন্যান্য পশ্চাৎপদ শ্রেণীর হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। ভারত সরকার আন্তঃজাতি বিবাহের মাধ্যমে সামাজিক একীকরণের জন্য ড। আম্বেদকর প্রকল্পের আওতায় আন্তঃজাতির দম্পতিদের আর্থিক উত্সাহ প্রদান করে। ওড়িশা, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, কর্ণাটক, হিমাচল প্রদেশ, বিহার, তামিলনাড়ু, রাজস্থান এবং মহারাষ্ট্রের মতো বিভিন্ন রাজ্য সরকারেরও একই রকম পরিকল্পনা রয়েছে।

দ্য টেলিগ্রাফের ২০০৩ সালের একটি নিবন্ধে দেখা গেছে যে শহুরে ভারতে আন্ত-বর্ণ বিবাহ এবং ডেটিং প্রচলিত ছিল। তবে দেশব্যাপী এই ধরণের অনুশীলনের অনুপাত এখনও কম। ২০০৫ সালের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ১৯৮১ এবং ২০০৫ সালের মধ্যে আন্ত-বর্ণ বিবাহ প্রায় দ্বিগুণ হয়েছিল কিন্তু কেবল ৬.১% স্তরে পৌঁছেছে। ভারতে বেশিরভাগ বিবাহ এখনও আন্তঃজাতি এবং আন্তঃধর্মীয় বিবাহের সাথে সীমাবদ্ধ রয়েছে যারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে "অর্থনৈতিক, শিক্ষামূলক, সাংস্কৃতিকভাবে উন্নত এবং নগরমুখী"।

ভারতে বর্ণ-সহিংসতা

স্বতন্ত্র ভারত বর্ণ-সংক্রান্ত সহিংসতা প্রত্যক্ষ করেছে। ২০০৪ সালে জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৯৯৬ সালে দলিতদের বিরুদ্ধে সংঘটিত সহিংস কাজকর্মের প্রায় ৩১,৪৪০ টি ঘটনা ঘটেছে।] জাতিসংঘের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে যে প্রতি ১০,০০০ দলিত লোকের প্রতি ১.৩৩ টি হিংসাত্মক কাজ হয়েছে। প্রসঙ্গে, ২০০৪ সালে জাতিসংঘ উন্নত দেশগুলিতে প্রতি ১০,০০০ লোকের প্রতি

সহিংস আচরণের ৪০ থেকে ৫৫ টি মামলার রিপোর্ট করেছে। এই ধরনের সহিংসতার একটি উদাহরণ ২০০৬ সালের খায়রলানজি হত্যাযজ্ঞ।

তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি (নৃশংসতা প্রতিরোধ) আইন, ১৯৮৯ এর লক্ষ্য ছিল তফসিলি জাতি ও তপসিলি উপজাতির সদস্যদের বিরুদ্ধে নৃশংসতা ও বৈষম্য রোধ ও শাস্তি দেওয়া। এই আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে "ক্ষতিগ্রস্থদেরকে অশ্লীল পদার্থ খেতে বা পান করতে বাধ্য করা; মলমূত্র, নর্দমা, শবদেহকে তাদের বাড়ী বা যৌগিক স্থানে ফেলে রাখা; জমি দখল; অপমান; যৌন নির্যাতন"। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো আইনের অধীনে প্রাপ্ত অপরাধের পরিসংখ্যানকে বার্ষিক প্রতিবেদনের অংশ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এই আইনের অধীনে রিপোর্ট করা মোট অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে তবে সাজার হার কম ছিল। ২০১২ সালে তফসিলি জাতিগোষ্ঠীর সদস্যদের বিরুদ্ধে অপরাধ ৭.৩% এবং তফসিলি উপজাতির বিরুদ্ধে ২৬.৫% বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইতিবাচক পদক্ষেপ

ভারতে সংরক্ষণ

ভারতের সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদে বর্ণ ভিত্তিক বৈষম্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং অনুচ্ছেদে ১ অনুচ্ছেদে অস্পৃশ্যতার চর্চাকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। ১৯৫৫ সালে, ভারত অস্পৃশ্যতা (অপরাধ) আইন কার্যকর করে 1976 সালে নাম পরিবর্তন করে নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ আইন হিসাবে নামকরণ করা হয়)। এটি আইনী নাগালের থেকে বাধ্যতামূলক প্রয়োগের অবধি প্রসারিত করে। ১৯৯৯ সালে ভারতে তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি (অত্যাচার প্রতিরোধ) আইন পাস হয়েছিল।

তফসিলি ও তপশিলী উপজাতির আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি তদন্ত, নিরীক্ষণ, পরামর্শ এবং মূল্যায়ন করার জন্য জাতীয় তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি কমিশন গঠন করা হয়েছিল। তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতি হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ লোকদের জন্য একটি সংরক্ষণ ব্যবস্থা 50 বছরেরও বেশি সময় ধরে বিদ্যমান। ভারতে বেসরকারী মালিকানাধীন মুক্ত বাজার কর্পোরেশনের উপস্থিতি সীমিত এবং সরকারী খাতের চাকরিগুলি এর অর্থনীতিতে শতকরা দশমিক কাজের উপর প্রভাব ফেলেছে। 2000 সালের একটি প্রতিবেদনে অনুমান করা হয়েছে যে ভারতে বেশিরভাগ চাকরিগুলি সরকার বা সরকারের সংস্থাগুলির মালিকানাধীন সংস্থাগুলিতে ছিল। ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ভারত কর্তৃক প্রয়োগ করা রিজার্ভেশন ব্যবস্থা আংশিকভাবে সফল হয়েছে, ১৯৯৫ সালে দেশব্যাপী সমস্ত চাকরির কারণে ১৭.২ শতাংশ চাকরি সবচেয়ে নিম্ন বর্ণের লোকদের হাতে ছিল।

ভারত সরকার চারটি দলে সরকারী চাকরীর শ্রেণিবদ্ধ করে। গ্রুপ এ চাকরিগুলি সিনিয়র সর্বাধিক, উচ্চ বেতনের পদে সরকার, এবং গ্রুপ ডি জুনিয়র সর্বাধিক, সর্বনিম্ন বেতন পজিশনে। গ্রুপ ডি জবগুলিতে, নিম্ন বর্ণের শ্রেণিবদ্ধ ব্যক্তিদের দ্বারা প্রাপ্ত পদের শতাংশ তাদের জনসংখ্যার তুলনায় 30% বেশি। গ্রুপ সি পদের হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ সমস্ত চাকরিতে, সর্বনিম্ন বর্ণের লোকদের দ্বারা পরিচালিত কাজের

শতাংশ তাদের জনসংখ্যার জনসংখ্যা বন্টনের সমান। গ্রুপ এ এবং বি জবগুলিতে, নিম্ন বর্ণের শ্রেণিবদ্ধ ব্যক্তিদের দ্বারা প্রাপ্ত পদের শতাংশ তাদের জনসংখ্যার তুলনায় 30% কম।

ভারতে সর্বাধিক বেতনের, সিনিয়র-সর্বাধিক পজিশনে সবচেয়ে নিম্নবর্ণের লোকের উপস্থিতি দশগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, ১৯৫৯-এ সমস্ত চাকরীর ১.১ শতাংশ থেকে ১৯৯৯ সালে সমস্ত চাকরির ১০.১২ শতাংশ হয়েছে।

- **মণ্ডল কমিশন**

মণ্ডল কমিশন 1979 সালে "সামাজিক বা শিক্ষাগতভাবে পিছিয়ে পড়া চিহ্নিতকরণ" এবং লোকদের বর্ণ বৈষম্য নিরসনের জন্য আসন সংরক্ষণ এবং কোটার প্রশ্ন বিবেচনা করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৮০ সালে কমিশনের প্রতিবেদনে ভারতীয় আইনের আওতায় গৃহীত পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে, যার মাধ্যমে নিম্ন বর্ণের অতিরিক্ত সদস্য - অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণির লোকদেরকে ২৩ শতাংশ ছাড়াও সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আরও ২৭ শতাংশ সরকারী চাকরী এবং স্লটে একচেটিয়া প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়েছিল। দলিত ও উপজাতিদের জন্য ইতিমধ্যে সংরক্ষিত। ১৯৯০ সালে ভি পি পি সিংয়ের প্রশাসন যখন মন্ডল কমিশনের সুপারিশগুলি বাস্তবায়নের চেষ্টা করে তখন দেশে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়। অনেকে অভিযোগ করেছেন যে রাজনীতিবিদরা নির্ভুল ব্যবহারিক নির্বাচনের উদ্দেশ্যে বর্ণ ভিত্তিক সংরক্ষণের নগদ অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদ

বর্ণবাদ হ'ল ১৯৯৮ সাল থেকে ১৯৯৮ সাল থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকাতে (বর্তমানে নামিবিয়া) প্রতিষ্ঠিত জাতিগত বিভেদ ব্যবস্থার একটি ব্যবস্থা ছিল। বাথস্ক্যাপ (বস-হুড বা বস-শিপ) এর ভিত্তিতে একটি কর্তৃত্ববাদী রাজনৈতিক সংস্কৃতি দ্বারা চিহ্নিত ছিল পার্থেইড, যা নিশ্চিত করেছে যে দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে এই দেশের সংখ্যালঘু সাদা জনগোষ্ঠীর দ্বারা আধিপত্য ছিল। সামাজিক স্তরবিন্যাসের এই পদ্ধতি অনুসারে, সাদা নাগরিকদের সর্বোচ্চ মর্যাদা ছিল, তারপরে এশিয়ান এবং কালার্ডস, পরে কৃষ্ণ আফ্রিকানরা ছিলেন। বর্ণবাদ সংক্রান্ত অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার এবং সামাজিক প্রভাব আজও অব্যাহত রয়েছে

প্রথম বর্ণবাদী আইনটি ছিল মিশ্র বিবাহের নিষিদ্ধকরণ আইন, ১৯৪৯ এবং ১৯৫০ সালের অনৈতিক সংশোধন আইনটি ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করা হয়েছিল, যা দক্ষিণ আফ্রিকার বেশিরভাগ নাগরিকের জন্য বর্ণবাদী বৈষম্য জুড়ে বিবাহ বা যৌন সম্পর্ককে অবৈধ করে তুলেছে। জনসংখ্যা নিবন্ধন আইন, ১৯৫০ সমস্ত দক্ষিণ আফ্রিকানকে উপস্থিতি, পরিচিত বংশ, আর্থ-সামাজিক অবস্থান এবং সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রার উপর ভিত্তি করে চারটি জাতিগত গোষ্ঠীর মধ্যে একটিতে শ্রেণিবদ্ধ করেছে: "কালো", "সাদা", "রঙিন" এবং "ভারতীয়", শেষ দুটি যার মধ্যে বেশ

কয়েকটি উপ-শ্রেণিবদ্ধকরণ অন্তর্ভুক্ত ছিল। থাকার জায়গাগুলি বর্ণগত শ্রেণিবদ্ধকরণ দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল। ১৯৬০ থেকে ১৯৮৩ সালের মধ্যে, আধুনিক ইতিহাসের বৃহত্তম বৃহত্তম গণ-উচ্ছেদের বর্ণবাদ বর্ণনার ফলে 3.5 মিলিয়ন কালো আফ্রিকানদের তাদের বাড়িঘর থেকে সরিয়ে পৃথক পৃথক অঞ্চলে বাধ্য করা হয়েছিল। এই লক্ষ্যবস্তু অপসারণগুলির বেশিরভাগটি কালো জনসংখ্যা দশটি মনোনীত "উপজাতীয় জন্মভূমি" পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখার উদ্দেশ্যে ছিল, যাদের বান্টুস্তান নামেও পরিচিত, যার মধ্যে চারটি নামমাত্র স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। সরকার ঘোষণা করেছিল যে স্থানান্তরিত ব্যক্তিরা বান্টুস্তানদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে তাদের দক্ষিণ আফ্রিকার নাগরিকত্ব হারাবে।

বর্ণবাদ আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া বিরোধীদের সূচনা করেছিল, যার ফলশ্রুতি বিংশ শতাব্দীর কয়েকটি প্রভাবশালী বিশ্বব্যাপী সামাজিক আন্দোলন ঘটে। এটি জাতিসংঘে প্রায়শই নিন্দার লক্ষ্য ছিল এবং দক্ষিণ আফ্রিকার উপর একটি বিস্তৃত অস্ত্র ও বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি নিয়ে আসে। ১৯৭০ এবং ১৯৮০ এর দশকে বর্ণবাদ বিরোধী অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ ক্রমবর্ধমান জঙ্গি হয়ে ওঠে, জাতীয় পার্টি সরকার কর্তৃক বর্বর ক্র্যাকডাউন শুরু করে এবং সাম্প্রদায়িক সহিংসতা চালিয়ে যায় যা হাজার হাজার মারা বা আটক অবস্থায় পড়েছিল। বর্ণবাদী ব্যবস্থার কিছু সংস্কার গৃহীত হয়েছিল, যার মধ্যে সংসদে ভারতীয় ও বর্ণযুক্ত রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এই পদক্ষেপগুলি বেশিরভাগ নেতাকর্মী গোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

1987 এবং 1993 এর মধ্যে, ন্যাশনাল পার্টি আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস (এএনসি), বর্ণবাদ বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনের শীর্ষস্থানীয়, পৃথকীকরণের অবসান ঘটিয়ে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধি প্রবর্তনের জন্য দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় বসেছে। ১৯৯০ সালে, নেলসন ম্যান্ডেলার মতো শীর্ষস্থানীয় এএনসির ব্যক্তিত্বদের কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। বর্ণবাদ আইনটি ১৯৯১ সালের ১ ই জুন বাতিল করা হয়েছিল, ১৯৯৪ সালের এপ্রিল মাসে সর্বজনীন ভোটাধিকারের অধীনে বহিরাগত নির্বাচন বিচারাধীন ছিল।

প্রতিটি কৃষ্ণভূমি নিজস্ব শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পুলিশ সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ করে। কৃষ্ণাঙ্গদের কঠোর অ্যালকোহল কিনতে দেওয়া হয়নি। তারা কেবলমাত্র রাষ্ট্র-উত্পাদিত নিম্নমানের বিয়ার কিনতে সক্ষম হয়েছিল (যদিও এই আইনটি পরে শিথিল করা হয়েছিল)। পাবলিক বিচ, সুইমিং পুল, কিছু পথচারী সেতু, ড্রাইভ-ইন সিনেমা পার্কিংয়ের জায়গা, কবরস্থান, পার্ক এবং পাবলিক টয়লেটগুলি আলাদা করা হয়েছিল। সাদা অঞ্চলে সিনেমা ও থিয়েটারগুলিকে কৃষ্ণাঙ্গদের প্রবেশের অনুমতি ছিল না। কৃষ্ণাঙ্গ অঞ্চলে বাস্তবে কোনও সিনেমাঘর ছিল না। সাদা অঞ্চলের বেশিরভাগ রেস্তোঁরা ও হোটেলগুলিকে কর্মী ব্যতীত কৃষ্ণাঙ্গদের প্রবেশের অনুমতি ছিল না। 1957 সালের চার্চ নেটিভ লস অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের অধীনে কৃষ্ণাঙ্গ গির্জাগুলিতে যোগ দেওয়ার জন্য কৃষ্ণাঙ্গদের নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, তবে এটি কখনও কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়নি, এবং আইনের হস্তক্ষেপ ছাড়াই দৌড়াদৌড়ি করতে পারে এমন কয়েকটি জায়গার মধ্যে গির্জা অন্যতম ছিল। অন্যদিকে, সাদাদের জন্য করের হার কৃষ্ণাঙ্গদের চেয়ে যথেষ্ট বেশি ছিল।

কৃষ্ণাঙ্গরা কখনও সাদা অঞ্চলে জমি অধিগ্রহণ করতে পারেনি। জন্মভূমিতে, জমিটির বেশিরভাগ অংশ একটি "উপজাতির" অন্তর্ভুক্ত ছিল, যেখানে স্থানীয় সরদার সিদ্ধান্ত নেবেন যে জমিটি কীভাবে ব্যবহার করতে হবে। এর ফলে প্রায় সব শিল্প ও কৃষিজমি এবং মুল্যবান আবাসিক জমির বেশিরভাগ শ্বেতের মালিক ছিল। "জন্মভূমি" "স্বতন্ত্র" হয়ে উঠলে বেশিরভাগ কৃষ্ণাঙ্গ তাদের দক্ষিণ আফ্রিকার নাগরিকত্ব ছিনিয়ে নিয়েছিল এবং তারা আর দক্ষিণ আফ্রিকার পাসপোর্টের জন্য আবেদন করতে সক্ষম হয় নি। পাসপোর্টের জন্য যোগ্যতার প্রয়োজনীয়তা কৃষ্ণাঙ্গদের পক্ষে পূরণ করা কঠিন ছিল, সরকার দাবি করে যে একটি পাসপোর্ট একটি অধিকার ছিল না, অধিকার নয় এবং সরকার কৃষ্ণাঙ্গদের অনেকগুলি পাসপোর্ট দেয়নি। বর্ণ বর্ণ ও সংস্কৃতি আইনকে বিস্তৃত করে এবং মূলধারার বেশিরভাগ মিডিয়া তাদের দ্বারা আবদ্ধ ছিল।

জনসংখ্যা চারটি গ্রুপে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছিল: আফ্রিকান, হোয়াইট, ইন্ডিয়ান এবং কালার্ড (দক্ষিণ আফ্রিকার আইনে তাদের আইনী সংজ্ঞা বোঝাতে মূলধন)। রঙিন গোষ্ঠীতে বান্টু, খোইসান, ইউরোপীয় এবং মালে বংশধর সহ মিশ্র বংশোদ্ভূত লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৫৩ সালের বান্টু শিক্ষা আইন দ্বারা শিক্ষাকে পৃথক করা হয়েছিল, যা দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক পৃথক শিক্ষার ব্যবস্থা তৈরি করেছিল এবং কৃষ্ণাঙ্গ মানুষকে শ্রমজীবী শ্রেণির মতো জীবন যাপনের জন্য তৈরি করেছিল। ১৯৫৯ সালে কৃষ্ণ, বর্ণযুক্ত এবং ভারতীয় মানুষের জন্য পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করা হয়েছিল। বিদ্যমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নতুন কালো শিক্ষার্থী ভর্তির অনুমতি ছিল না। ১৯ 1978 সালের আফ্রিকান মিডিয়াম ডিক্রিমিকে স্বদেশের বাইরের উচ্চ বিদ্যালয়ে সমান ভিত্তিতে আফ্রিকান এবং ইংরেজি ব্যবহারের প্রয়োজন ছিল।

ঔপনিবেশবাদ এবং বর্ণবাদ বর্ণের কালো এবং বর্ণযুক্ত মহিলাদের উপর একটি বড় প্রভাব ফেলেছিল, যেহেতু তারা উভয় বর্ণ ও লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার হয়েছিল। জুডিথ নল্‌দে যুক্তি দিয়েছেন যে সাধারণভাবে দক্ষিণ আফ্রিকার মহিলারা বর্ণবাদী ব্যবস্থার অধীনে "ব্যক্তি হিসাবে তাদের মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন"। চাকরিগুলি প্রায়শই খুঁজে পাওয়া শক্ত ছিল। অনেক কৃষ্ণাঙ্গ ও বর্ণযুক্ত মহিলা কৃষিকাজ বা গৃহকর্মী হিসাবে কাজ করেছিলেন, তবে মজুরি খুব কম ছিল, যদি তা বিদ্যমান ছিল। শিশুরা অপুষ্টি ও স্যানিটেশন সমস্যাজনিত রোগে ভুগছিল এবং তাই মৃত্যুর হার বেশি ছিল। ১৯৩৩ সালের নেটিভস আরবান অঞ্চল অ্যাক্টের মাধ্যমে কৃষ্ণ ও বর্ণবাদী শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রিত আন্দোলন এবং পাশের আইনগুলি পরিবারের সদস্যদের একে অপর থেকে পৃথক করেছিল, কারণ পুরুষরা শহুরে কেন্দ্রে তাদের কর্মসংস্থান প্রমাণ করতে পারত যদিও বেশিরভাগ মহিলা নিছক নির্ভরশীল ছিল; ফলস্বরূপ, তারা গ্রামাঞ্চলে নির্বাসিত হওয়ার ঝুঁকি নিয়েছিল। এমনকি গ্রামাঞ্চলে মহিলাদের জমির মালিকানার আইনী বাধা ছিল এবং শহরের বাইরে চাকরির খুব কমই ছিল।

বর্ণভেদকে ১৯৯০ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত একাধিক আলোচনার মাধ্যমে ভেঙে ফেলা হয়, এটি একটি ক্রান্তিকাল পর্যায়ক্রমে শেষ হয় যার ফলস্বরূপ দেশটির

১৯৯৪ সালের সাধারণ নির্বাচন হয়েছিল, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম বিশ্বব্যাপী ভোটাধিকারের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

১৯৯০ সালে, সরকার এবং এএনসির মধ্যে দুটি বৈঠক করে আন্তরিকতার সাথে আলোচনা শুরু হয়েছিল। আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসনের দিকে শান্তিপূর্ণ উত্তরণের দিকে আলোচনার পথ প্রশস্ত করা। এই বৈঠকগুলি দেশের অভ্যন্তরে এখনও যথেষ্ট উত্তেজনা সত্ত্বেও আলোচনার পূর্বশর্ত স্থির করতে সফল হয়েছিল। ১৯৯১ সালে বর্ণবাদ আইন বাতিল করা হয়েছিল।

প্রথম বৈঠকে এনপি এবং এএনসি আলোচনা শুরু করার শর্ত নিয়ে আলোচনা করেছিল। রাষ্ট্রপতির সরকারী বাসভবন গ্রোয়েট শিউরে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। তারা গ্রোয়েট শিউর মিনিট প্রকাশ করেছিল, যাতে বলা হয়েছিল যে আলোচনা শুরু হওয়ার আগে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হবে এবং সমস্ত নির্বাসিতকে ফিরে যেতে দেওয়া হবে।

ক্ষমতার পরিবর্তন হিংস্র হবে বলে আশঙ্কা ছিল। এটি এড়ানোর জন্য, সমস্ত পক্ষের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সমাধানে পৌঁছানো অপরিহার্য ছিল। ১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে কনভেনশন ফর ডেমোক্রেটিক সাউথ আফ্রিকা (সিওডিএসএ) বহুসত্তা ট্রানজিশনাল সরকার গঠনের এবং সমস্ত গ্রুপের রাজনৈতিক অধিকার বিস্তারের নতুন সংবিধান নিয়ে আলোচনা শুরু করে। কোডেসা ইচ্ছাকৃত এক ঘোষণাপত্র গ্রহণ করে এবং একটি "অবিভক্ত দক্ষিণ আফ্রিকা" - এ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ১৯৯৩ সালে, ডি ক্লার্ক এবং ম্যান্ডেলা যৌথভাবে "বর্ণবাদী শাসনের অবসান, এবং একটি নতুন গণতান্ত্রিক দক্ষিণ আফ্রিকার ভিত্তি স্থাপনের জন্য তাদের কাজের জন্য" নোবেল শান্তি পুরষ্কার পেয়েছিলেন।